অধ্যক্ষ জে. সি. সেনগুপ্ত ঃ শতাব্দীর অঞ্জলি

কালের সুতোয় ব্যক্তির ফুল দিয়ে সমষ্টির মালা গাঁথা হয়। বহু ছাত্রছাত্রীর পদধ্বনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অলিন্দে ক্লাসঘরে আওয়াজ তুলেছে, এখনও তুলছে, ভবিষ্যতেও তুলবে। সেই যৌবনজলতরঙ্গকে ঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্যে—প্রয়োজনে বাঁধ দেওয়ার জন্যে, বহু বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এই কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন এবং করে চলেছেন। আর, সব কিছুর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে সবার উপরে এসেছেন এই অন্যতম কলেজের সুদক্ষ অধ্যক্ষরা।

এমনই এক অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক যতীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত—যাঁকে সবাই উল্লেখ করতেন জে. সি. সেনগুপ্ত বলে। আমার ছাত্রী জীবনের গোড়ার দিকে (১৯৫২-৫৩ সাল হবে) যখন আমরা তখনকার থার্ড ইয়ার বি.এস.সি (পদার্থবিদ্যা) পড়ি, তখন থেকেই অধ্যাপক সেনগুপ্তকে দেখেছি অধ্যক্ষ হিসেবে।

উনি ছিলেন বিশিষ্ট উদ্ভিদ্‌বিদ্—প্লান্ট্ ফিসিওলজি বিশেষজ্ঞ। আমার স্বামী প্রয়াত অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ওঁর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আমি ওঁর ছাত্রী ছিলাম না, তবে স্নেহের পাত্রী ছিলাম। অধ্যক্ষ সেনগুপ্ত হিসেবেই ওঁকে প্রথম জেনেছি—বন্ধুদের কাছ থেকে সেই সঙ্গেই জেনেছি ওঁর অধ্যাপনার উৎকর্ষ এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে ওঁর পারদর্শিতা। তার অনেক পরে জেনেছি ঐ বিশেষ রাশভারি, 'জার্মান পদক্ষেপচারী' (আমাদের ফিসিক্স্ ল্যাবরাটারীর সামনে দিয়ে উনি বটানি বিভাগে যেতেন) মানুষটির লৌহবর্মের ছদ্মবেশের আড়ালে একটি অতি স্নেহশীল পিতৃমনের অবস্থিতি।

অধ্যক্ষের সহধর্মিনী রূপে এখানে শ্রীমতী সেনগুপ্তের উল্লেখ করার বিশেষ অবকাশ রয়েছে। যাঁরা তাঁর গান শুনেছেন তাঁরা জানেন যে অমন সুকণ্ঠ সুলভ নয়, আর যাঁরা একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন তাঁরা জানেন অমন স্নেহশীলতাও দুর্লভ। এ

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়*

সময় কলেজের যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সেনগুপ্তের উপস্থিতি এক মনোরম পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করত।

বোধহয় ১৯৫৪-৫৫ সালে হবে—তখন যোধপুর পার্কের জমিতে ধান চাষ হয়, জল জমে—মানে জলা জমি। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষণার জন্যে ঐ সব জমি থেকে 'হাইড্রা' সংগ্রহ করে আনত প্রাণিবিদ্যা বিভাগের পি.এইচ্.ডি'র ছাত্ররা। একদিন স্যারের সঙ্গে অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯৫৩ সালে প্রাণিবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দেন) কথোপকথন হচ্ছে এইরকম ঃ 'জান শিবতোষ, নতুন যে যোধপুর পার্ক হচ্ছে, সেখানে একটা প্লট্ পেয়েছি।' 'এটা কোথায় স্যার, কোন জায়গায়?' 'আরে ওখানেত এখন জলাজমি—যেখান থেকে তোমার ল্যাবের ছেলেরা 'হাইড্রা' আনতে যায়।' বলে দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

কিছুদিন পরের ঘটনা। এর মধ্যে স্যারের কন্যা এবং আমাদের বিশেষ বন্ধু (এবং স্নেহের পাত্রীও বটে) রত্না (যশোধরা) স্টেট্ স্কলারশিপ পেয়ে অক্সফোর্ড গেছে। ১৯৫৯-এর শেষে আমাদের লণ্ডন হয়ে নিউ ইয়র্ক যাবার কথা শুনে স্যার বললেন 'শিবতোষ-অঞ্জলি, তোমরা লণ্ডনে ত দু' এক দিন থাকবে, পারলে রত্নার একটু খবর নিও', তখনত আর ইন্টারনেট-ই-মেলের যুগ দুরত্বের দুঃখ কমিয়ে দেয়নি!

যাবার সময় আমরা লণ্ডন থেকে ফোনে রত্নার খবর নিলাম—বাড়ীর খবরের জন্যে উৎসুক রত্না বললে 'আমি বাবাকে লিখে জানাব যে আপনাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ফিরবেন যখন, তখন কিন্তু অক্সফোর্ডে আসতে হবে।' ১৯৬১ সালে ফেরার সময় অক্সফোর্ডে আমরা তিন-চার দিন কাটিয়ে এসেছিলাম। সে সময় অশোক মুখার্জিও ওখানে ছিলেন, দেখাও হয়েছিল।

টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ে চলচ্চিত্রের মত—যার মাধ্যমে একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে।

স্যার এবং অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় প্রায়ই তখন meeting-এ (CSIR, UGC ইত্যাদি) যোগ দিতে দিল্লী যাতায়াত করতেন। দিল্লীতে খুব ভাল পাব্‌দা মাছ পাওয়া যেত স্যার খুব পছন্দ করতেন। আর 'মোতিমহলের' কাবাব পছন্দ করতেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। এই দুটি জিনিষ ওঁদের সঙ্গে প্রায়ই আসত।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

রাতের ফ্লাইটে একবার দুজনের প্যাকেট দুটি প্লেনের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হয়ে যায় এবং রাত্রে বাড়ী পৌঁছে দুজনে তা জানতে পারেন। পরের দিন রবিবার ছিল। সকালে ফোনে দুজনের কথোপকথন হচ্ছে এই রকম, 'স্যার, আপনার পাব্‌দার প্যাকেট আমার কাছে—আজ রবিবার। কালোজিরে আর হলুদ দিয়ে মাছ রান্না হচ্ছে। স্যার কাবাবটা কেমন?' স্যার ওদিক থেকে নাকি উত্তরে বলেছিলেন 'breakfast-এর সময় গরম করে খেয়েছি—অপূর্ব!' বলেই 'হাঃ হাঃ' হাসির ঝড়।

এই যে একটা সরস সজীব মন—দিলখোলা হাসি—আজও কানে বাজে। সেটা বোধহয় ১৯৬৫-৬৬ সাল হবে, রত্না আর অমিয় (অধ্যাপক অমিয় বাগচী) বিয়ের পর তখন কেম্ব্রিজে। সে সময় স্যার এবং শ্রীমতী সেনগুপ্তের খুব একা লাগত। আমাদের প্রায়ই বাড়ীতে ডাকতেন নানা উপলক্ষে, এবং নানা রকম সুস্বাদু খাবার রান্না করে খাওয়াতেন।

মধ্যমগ্রামের কাছে আমাদের একটা ছোট বাগান বাড়ী ছিল। স্যার আমাদের বহু রকমারী গাছ দিয়েছিলেন। তখন গ্রীষ্মের ছুটি—জুন মাসে একবার বৃক্ষরোপণের সপ্তাহে স্যার জানালেন ওঁরা আমাদের বাগানে আসবেন। আমরা খুব খুশী—সাগ্রহে অপেক্ষা করছি কখন এসে পৌঁছবেন—কী কী খাওয়ান হবে ইত্যাদি। স্যারের গাড়ী এল—দরজা খুলে ওঁরা নামলেন আর তারপর নামান হতে লাগল গাছের সারি, ৬।৭ রকমের গাছ।

বললেন 'শিবতোষ এখুনি 'বৃক্ষরোপণ' হবে, গর্ত খোঁড়াও'। এরপর শ্রীমতী সেনগুপ্তের সুমধুর কণ্ঠে 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও' গানের সঙ্গে আমাদের বাগানে স্যার এবং স্যারের ছাত্র মিলে 'বৃক্ষরোপণ' করলেন।

আর একটি ঘটনা বলি—যেটি না বললে কত বড় উদার মন ওঁদের ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে না।

ওঁদের বাড়ীতে (যোধপুর পার্কে) যখন যেতাম শ্রীমতী সেনগুপ্ত (আমি 'মাসীমা' বলতাম) নানারকম গল্প বলতেন—আমি অনেক কিছু শিখতাম। একবার বললেন "জান অঞ্জলি, সে অনেকদিন আগেকার কথা—দেশ ভাগের আগে। কলকাতায় আমরা একটা ফ্ল্যাটে থাকি। তখন 'ঢাকা মেল' বলে ঢাকা থেকে একটি ট্রেন আসত দুপুর বেলা। আমরা সেই ট্রেনের সময় পেরিয়ে না গেলে দুপুরে খেতে বসতাম না, কারণ সেই ট্রেনে আত্মীয়স্বজন, চেনা-জানা কেউ-না-কেউ প্রায় দিনই আসতেন।"

এইরকম উদার সহৃদয় মন এখনকার দিনে বিরল। আমাদের সন্তান সন্ততিদের সামনে এমন উদাহরণ কি আমরা বেশী রাখতে পেরেছি?

এমনি বহু ঘটনা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। তখন শীতের দিন, জানুয়ারী মাস, আমরা মধ্যমগ্রামের বাগানে। স্যারের অকস্মাৎ প্রয়াণের সংবাদে মর্মাহত হয়েছিলাম। 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'।

---

* পদার্থবিদ্যা (১৯৫২-৫৬)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073